৫. মোগলবিরোধী বিদ্রোহ

মোগল শাসনের গোড়া থেকেই একের পর এক বিদ্রোহ ঘটেছে। বিদ্রোহগুলির চরিত্র এক ছিল না। পরিস্থিতি অনুযায়ী এর রূপ হয়েছে বিভিন্ন। কোথাও তা ছিল কৃষক বিদ্রোহ, কোথাও জমিদার বিদ্রোহ, কোথাও তা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যা থেকে উদ্ভূত, কোথাও তার সঙ্গে আঞ্চলিক স্বাধীনতার প্রশ্ন জড়িত, কোথাও বিদ্রোহ ছিল ধর্ম ও বর্ণভিত্তিক। অনেক বিদ্রোহের সূচনা প্রাক্-আওরঙ্গজেব যুগে। কিন্তু নিঃসন্দেহে তাঁর শাসনকালেই বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(ক) মাতিয়া বিদ্রোহ : ১৬৮৫ খ্রি.-এ গুজরাতে সংঘটিত হয় মাতিয়া বিদ্রোহ। মাতিয়ারা একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়। ইমামউদ্দিন নামে এক সন্ত এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কুনবি কৃষকরা এই ধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কৃষক ছাড়াও ব্যবসায়ী ও কারিগররা এই সম্প্রদায়ে যোগ দেয়। মাতিয়া বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ আওরঙ্গজেবের আহ্বানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পথে এক মাতিয়া নেতার মৃত্যু। কিন্তু এর এক পটভূমি ছিল। ১৬৮০ খ্রি.-এর পর থেকে গুজরাতে তীব্র খাদ্য-সংকট দেখা দেয়। ব্যবসায়ীদের ওপর অতিরিক্ত কর চাপানো হয়। রুপার অভাব হেতু বাজারে মুদ্রার জোগান হ্রাস পায় যার ফলে কৃষকদের রাজস্ব বাকি পড়ে। এই সাধারণ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে মাতিয়া নেতার ওপর মোগলদের জুলুম বিদ্রোহে ইন্ধন জোগায়। বারো থেকে পনেরো হাজার মাতিয়া-অনুগামী ব্রোচ শহরের দিকে ধাবিত হয়ে ফৌজদারকে সপরিবারে হত্যা করে। তারা আওরঙ্গজেবের বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে সুলতান হিসাবে ঘোষণা করে। তীব্র যুদ্ধের পর মাতিয়ারা পরাস্ত হয়। মাতিয়া বিদ্রোহের মধ্যে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রভাব থাকলেও এর মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক। কৃষকসহ ছোটো বণিক ও কারিগর বহু সংখ্যায় এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। ধর্মবিশ্বাস তাদের সংগ্রামী স্পৃহাকে সংগঠিত করে।

(খ) কোলি বিদ্রোহ : সমগ্র মোগল যুগ ধরে গুজরাতের কোলি কৃষকরা বিদ্রোহ করেছে। তারা কৃষক ও ক্ষেতমজুর হিসাবে কাজ করত। মনে করা হয় এরা পূর্বে আদিবাসী থাকলেও পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে তারা বর্ণব্যবস্থায় প্রবেশ করে ও জাতে ওঠার চেষ্টা করে। তারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলেও দাবি করে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুযোগ পেলেই কোলিরা বিদ্রোহ করেছে। আওরঙ্গজেবের শাসনকালে চানওয়ালের দুঁদে কোলির সমর্থনে দারা শিকো নামে এক ব্যক্তি বিদ্রোহ করেন। মহাবৎ খান এই বিদ্রোহ দমন করেন। গুজরাতে মারাঠা আক্রমণ ঘটলে তাদের সাহায্যকারী হিসাবে কোলিরা আবার বিদ্রোহ ঘটায়। বরোদা শহর তারা দখল করে। ১৭১০-১২ খ্রি.-এ মুবারিজ খান নৃশংসভাবে বিদ্রোহ দমন করেন। আদি বাসিন্দা হিসাবে কোলিরা ওই অঞ্চলের সম্পদের ওপর তাদের পুরানো অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়। সাধারণ কোলি কৃষকগণ মোগল আমিন ও ফৌজদারদের অত্যাচারে জর্জরিত হচ্ছিল। এরসঙ্গে জড়িত ছিল সম্প্রদায় হিসাবে বর্ণব্যবস্থায় সম্মানজনক স্থান পাওয়ার চেষ্টা।

(গ) **কুর্মি বিদ্রোহ :** ১৬৭০ থেকে ১৬৮০ খ্রি.-এর মধ্যে উত্তরপ্রদেশের আমেথি অঞ্চলের জগদীশপুরে কুর্মিরা বিদ্রোহ করে। তাদের নেতা দাসীরাম নিজেকে 'পীর' বলে দাবি করে ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন। প্রায় বিয়াল্লিশটি গ্রামের কৃষকদের তিনি সংগঠিত করেন। জমিদারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করা হয়। এই পরিস্থিতিতে দাসীরাম নিহত হলে কুর্মিরা জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহের সংগঠনে ধর্মের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

(ঘ) **সৎনামী বিদ্রোহ :** সৎনামী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বীরভান নামে এক ধর্মপ্রচারক। তিনি নিজেকে উধো-কা-দাস বলে প্রচার করতেন। উধোর মধ্যেই তিনি ঈশ্বরের প্রকাশ অবলোকন করেন। এরা ছিল একেশ্বরবাদী। মোগলদের সঙ্গে সৎনামীদের সংঘাতে ধর্মীয় বিদ্বেষের ভূমিকা ছিল না। একেবারেই পার্থিব কারণে সংঘাতের সৃষ্টি। কাফি খানের বর্ণনা অনুসারে নারনুলের কাছে এক সৎনামী চাষির সঙ্গে এক পেয়াদার তীব্র বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহীরা নারনুল শহর অধিকার করে নেয়। ফৌজদার নিহত হয়। বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেন গরিবদাস হাডা। তারা নিজেদের থানা স্থাপন করে ও কর সংগ্রহ করতে থাকে। এদের অধিকৃত অঞ্চল ছিল দিল্লি থেকে মাত্র ষোল ক্রোশ দূরে। স্বর্ণশিল্পী, চর্মশিল্পী, দারুশিল্পী, ঝাড়ুদার প্রভৃতি নিম্নবর্গের মানুষ বিদ্রোহে সামিল হয়। স্বল্পপুঁজির ব্যবসায়ী ও গ্রামীণ কারিগরদের ক্ষোভ সৎনামী বিদ্রোহে প্রতিফলিত হয়। ধর্ম ও বর্ণের বিভেদ এখানে স্থান পায়নি। নিম্নবর্গ ও বর্ণের সবরকম মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ ছিল সৎনামী বিদ্রোহের আকস্মিকতা ও তীব্রতায় তা স্পষ্ট। স্বয়ং আওরঙ্গজেবের সেনাপরিচালনায় এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। লক্ষণীয় বিষয় এই যে রাজপুতসহ অনেক হিন্দু জমিদার এই বিদ্রোহে মোগলদের পক্ষ নেয়।

(ঙ) **জাঠ বিদ্রোহ :** মোগল শক্তির বিরুদ্ধে জমিদার ও কৃষকের সম্মিলিত বিদ্রোহের মধ্যে অন্যতম জাঠ বিদ্রোহ যা আওরঙ্গজেবকে দীর্ঘদিন বেগ দিয়েছে। দিল্লি, আগ্রা ও মথুরা অঞ্চলে যমুনার উভয়পাড়ে তাদের বাস। পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলিতে ও দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার পথ এই অঞ্চলের ওপর দিয়েই গেছে। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের শাসনকালেও এখানকার সমৃদ্ধ কৃষকরা মোগল ভূমিরাজস্ব আদায়কারী আমলাদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। ১৬৬৯ খ্রি.-এ জাঠ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন তিলপথের জমিদার গোকলা। বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল মথুরার ফৌজদার আবদুল নবীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ। বিদ্রোহীদের সংখ্যা ছিল প্রায় কুড়ি হাজার। আওরঙ্গজেব স্বয়ং অভিযান পরিচালনা করে বিদ্রোহ দমন করেন। গোকলা ধৃত হন ও পরে তাঁকে হত্যা করা হয়।

১৬৮৫ খ্রি.-এ রাজারামের নেতৃত্বে দ্বিতীয় জাঠ অভ্যুত্থান ঘটে। জাঠরা এবার পূর্বের চেয়ে বেশি সংগঠিত ছিল ও তারা গেরিলা যুদ্ধের আশ্রয় নেয়। তারা অবাধ লুঠতরাজও চালাত। আওরঙ্গজেব কচ্ছয়ার রাজপুত রাজা বিষাণ সিংহকে মথুরার ফৌজদার নিযুক্ত করে জাঠ বিদ্রোহ দমন করার দায়িত্ব দেন। জমিদারি স্বত্ব নিয়ে জাঠ ও রাজপুতদের দ্বন্দ্ব দীর্ঘ দিনের। ফলে জাঠ প্রতিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। রাজারাম নিহত হলে চূড়ামনের নেতৃত্বে বিদ্রোহ চলতে থাকে। ১৬৯১ খ্রি. নাগাদ চূড়ামন আত্মসমর্পণ করলেও বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিরোধ চলতেই থাকে। বিদ্রোহীদের লুঠতরাজও বন্ধ হয়নি। দিল্লি-আগ্রা অঞ্চলের পথঘাট নিরাপদ ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগলদের দুর্বলতার সুযোগে, চূড়ামন পুনরায় বিদ্রোহ করেন ও ওই অঞ্চল থেকে রাজপুত জমিদারগণ বিতাড়িত হয়। একটি স্বাধীন জাঠ রাজ্যও গড়ে ওঠে।

জাঠ বিদ্রোহের প্রথম স্তরে আগ্রা-মথুরা অঞ্চলের উঠতি জমিদারদের আয়ের উৎস ছিল লুঠতরাজ। এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বণিকরা নিয়মিত রাহাদারি ধরনের কর দিত। গৌতম ভদ্র মনে করেন, জাঠ জমিদারগণ মোগল রাজস্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণ কৃষকের ক্ষোভের সঙ্গে নিজেদের উচ্চাভিলাষ যোগ করেই ক্ষমতা দখল করতে সমর্থ হয়েছে। জাঠ বিদ্রোহে বর্ণ সংহতি, পুরানো জমিদারগোষ্ঠীকে দমন করে নতুন গোষ্ঠীর উত্থান, আঞ্চলিক বিক্ষোভ প্রভৃতি কারণ একাকার হয়ে গেছে। মোগল আমলের কৃষক বিদ্রোহের এই জটিল চরিত্রের প্রেক্ষাপটেই গোকলা, রাজারাম ও চূড়ামনের মতো নেতার উত্থান ঘটেছে।

(চ) **শোভা সিংহের বিদ্রোহ :** বাংলাদেশে ১৬৯৫ খ্রি.-এ চেতুয়ার জমিদার শোভা সিংহ বিদ্রোহ করেন। মেদিনীপুরের ঘাটালে দাশপুর অঞ্চলে তাঁর জমিদারি ছিল। এই অঞ্চলটি ছিল বাগদি প্রধান। শোভা সিংহকে বাগদি অথবা বহিরাগত ক্ষত্রিয় বলে দাবি করা হয়েছে। তিনি নানা ধরনের জনহিতকর কাজ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করে প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। শক্তিশালী স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে তিনি বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হন। এইভাবে শোভা সিংহ শক্তি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভেরও চেষ্টা করেন। মোগল সুবেদারদের দুর্বলতার সুযোগে শোভা সিংহ হুগলি পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করে নেন। গঙ্গার ধারে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চলতে থাকা নৌবাণিজ্যের ওপর থেকে তিনি শুল্ক আদায় শুরু করেন। মোগলবিরোধী কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শোভা সিংহের সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। বিক্ষুব্ধ পাঠানরাও তাঁর পক্ষ নেয়। এরকম এক অবস্থায় ১৬৯৭ খ্রি.-এ শোভা সিংহের মৃত্যু হয়। ফলে বিদ্রোহের নেতৃত্ব পাঠানদের হাতে চলে যায়। ক্ষমতা দখলের চেয়েও তারা লুঠতরাজের দিকে বেশি নজর দেয়। কাশিমবাজারের মতো বাণিজ্যিক কুঠি বারবার লুণ্ঠিত হয়। বিদেশি কোম্পানিগুলি আশঙ্কিত হয়। পাঠান নেতৃত্ব ও তাদের লুঠতরাজ বিদ্রোহের গণসমর্থন নষ্ট করে দেয়। বাংলায় শাহজাদা আজিম-উস-শানের সুবেদারির সময় এই বিদ্রোহ দমন করা হয়।

গৌতম ভদ্র মনে করেন জাতে ওঠার মানসিকতা ও লুঠতরাজের প্রবণতা ছাড়াও শোভা সিংহের বিদ্রোহে কৃষিব্যবস্থাজনিত সংকট ও মধ্যবর্তী স্তরের রাজস্ব সংগ্রহকারী জমিদারদের বিরুদ্ধে স্থানীয় জমিদার ও কৃষক বিক্ষোভের অন্য এক ধারাও ছিল। একটি মোগলবিরোধী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তী পর্যায়ের বিদ্রোহে লুঠতরাজই মুখ্য হয়ে ওঠে। ফলে সমাজের অন্যান্য শ্রেণির প্রাথমিক সমর্থন বিদ্রোহীরা হারায়। জমিদার ও কৃষকের যৌথ বিদ্রোহ প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করলেও শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

(ছ) **শিখ বিদ্রোহ ঃ** আওরঙ্গজেবের শাসনকালে শিখরাও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের শাসনকালেও মোগলদের সঙ্গে শিখদের সংঘাত ঘটে। সতীশ চন্দ্র মনে করেন সংঘাতের কারণ রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত, ধর্মীয় নয়। শিখ গুরুগণ 'সাচ্চা পাদশাহ' অর্থাৎ প্রকৃত সার্বভৌম উপাধি গ্রহণ করেন। তাদের সশস্ত্র অনুগামী ছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেবের শাসনকালে ১৬৭৫ খ্রি.-এ গুরু তেগবাহাদুরের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ব পর্যন্ত মোগল ও শিখদের মধ্যে কোনো সংঘাত ছিল না। মোগল-শিখ দ্বন্দ্বের কারণ নিয়ে মতভেদ আছে। ফারসি সূত্র অনুসারে তেগবাহাদুর হাফিজ আদম নামে জনৈক পাঠানের সঙ্গে একযোগে পাঞ্জাবে মোগলবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শিখ ঐতিহ্য অনুসারে তেগবাহাদুর পারিবারিক চক্রান্তের শিকার। পরিবারের কেউ কেউ গুরু হিসাবে তাঁর উত্তরাধিকারকে মেনে নেয়নি। মনে করা হয় শিখগুরু কিছু মুসলমানকে

শিখধর্মে ধর্মান্তরিত করেন। তিনি কাশ্মীরের শাসনকর্তা কর্তৃক ধর্মীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করেন। বস্তুত জাঠ কৃষক ও নিম্নবর্ণের কারিগরদের মধ্যে শিখধর্ম ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। সতীশ চন্দ্র মনে করেন এই শ্রেণির অর্থনৈতিক অসন্তোষ তেগবাহাদুরের প্রতিবাদের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল।

মোগল-শিখ দ্বন্দ্বের কারণ যাই হোক না কেন, আওরঙ্গজেবের শিখগুরুকে হত্যার সিদ্ধান্ত ছিল অযৌক্তিক ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত। ক্ষুব্ধ শিখগণ পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। শিখধর্ম এক ধর্মীয় আন্দোলন থেকে সামরিক আন্দোলনে পরিণত হয়। পরবর্তী গুরু গোবিন্দ সিংহের সাংগঠনিক ক্ষমতার জোরে শিখরা সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে। ১৬৯৯ খ্রি.-এ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন 'খালসা' নামে এক সামরিক সৌভ্রাতৃত্ব। কিন্তু শীঘ্রই পর্বতীয় রাজগণের সঙ্গে শিখদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ১৭০৪ খ্রি.-এ আনন্দপুরের যুদ্ধে শিখদের কাছে পরাজিত হয়ে পর্বতীয় রাজগণ মোগল হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। শিখ আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও গুরু গোবিন্দ সিংহের শক্তিবৃদ্ধিতে আওরঙ্গজেব ইতিমধ্যেই ভীত ছিলেন। তিনি লাহোরের শাসনকর্তা ওয়াজির খানকে শিখদের বিরুদ্ধে পবর্তীয় রাজাদের সাহায্য করার নির্দেশ দেন। মোগলসেনা আনন্দপুর দুর্গ অবরোধ করে। শিখসেনারা প্রবলভাবে প্রতিরোধ করলেও আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। মোগলরা শিখগুরুকে সপরিবারে নিরাপদে দুর্গ ত্যাগের প্রতিশ্রুতি দিলেও তাঁর দুই পুত্রকে বন্দি করা হয়। ইসলাম ধর্ম গ্রহণে স্বীকৃত না হওয়ায় সরহিন্দে তাদের হত্যা করা হয়। পরবর্তী একটি যুদ্ধে শিখগুরু অপর দুই সন্তানকে হারান। গুরু গোবিন্দ সিংহের পুত্রদের হত্যা আওরঙ্গজেবের নির্দেশে সংঘটিত হয়েছিল কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ বাদশাহ ইতিমধ্যেই ওয়াজির খানকে শিখগুরুর সঙ্গে একটি বোঝাপড়ায় আসতে বলেন। দাক্ষিণাত্যে অবস্থানরত বাদশাহকে যখন শিখগুরু সব ঘটনা জানান বাদশাহ তাঁকে দাক্ষিণাত্যে এসে সাক্ষাৎ করতে বলেন। ১৭০৬ খ্রি.-এর শেষদিকে গুরু গোবিন্দ সিংহ দাক্ষিণাত্যের উদ্দেশে রওনা হন কিন্তু তিনি পৌঁছানোর পূর্বেই আওরঙ্গজেবের জীবনাবসান হয়।

সতীশ চন্দ্র মন্তব্য করেছেন গুরু গোবিন্দ সিংহ মোগল শক্তিকে প্রতিরোধ করতে না পারলেও বা একটি স্বতন্ত্র শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলেও তিনি এমন এক পরম্পরা সৃষ্টি করে যান যা থেকে ভবিষ্যতে তাঁর স্বপ্ন সফল হয়েছিল। শিখ ধর্ম দেখিয়ে দেয় কেমন করে একটি সমতাবাদী ধর্মীয় আন্দোলন বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি রাজনৈতিক ও সামরিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে আঞ্চলিক স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যায়।

(জ) বিদ্রোহের চরিত্র : আওরঙ্গজেবের শাসনকালে সংঘটিত বিদ্রোহগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষক বিদ্রোহের রূপ নেয়। ইরফান হাবিব মনে করেন এই বিদ্রোহগুলিতে শ্রেণি হিসাবে কৃষকদের চেতনা প্রকাশ পায়নি। বেশিরভাগ বিদ্রোহই জমিদারদের স্বার্থচেতনার দ্বারা আচ্ছন্ন থেকেছে। ইক্তেদার আলম খান মোগল যুগের কৃষকবিদ্রোহের ব্যাপ্তির পেছনে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারের প্রসারের কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন এই জাতীয় অস্ত্রের ব্যবহার বিদ্রোহে গ্রামের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের কথাই প্রমাণ করে। গৌতম ভদ্র এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত নন। তাঁর মতে শিখ বা সৎনামী বিদ্রোহে শ্রেণি চেতনার প্রাথমিক উন্মেষের কথা ইরফান হাবিবও স্বীকার করেছেন। বিদ্রোহগুলিতে ধর্মীয় উন্মাদনা শ্রেণি চেতনার বাস্তব পরিস্থিতি থেকে রসদ সংগ্রহ করেছে। গৌতম ভদ্র মনে করেন গ্রামীণ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের চিহ্ন যে একেবারে নেই তা ঠিক নয়। কারণ ওয়াকাই-ই-আজমিরিতে উল্লেখ আছে যে এক গুজরকে রাজপুত জমিদার

হত্যা করলে জমিদারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ কৃষকেরা সরকারের কাছে আবেদন পাঠায়। জমিদার ও গ্রামীণ শোষক বিরোধী কৃষক সংগ্রাম যে দানা বাধতে পারেনি তার অন্যতম কারণ নানা ধরনের সামাজিক আদান-প্রদানের ফলে গ্রামীণ জমিদারি কর্তৃত্ব সাধারণ কৃষকের কাছে অনেকটা সহনীয় হয়ে উঠেছিল। ফলে উভয়ের মধ্যে ধর্ম ও বর্ণের ভিত্তিতে এক বন্ধন গড়ে ওঠে। ফলে মোগল রাষ্ট্রকেই তারা শোষণের হাতিয়ার বলে মনে করে। কৃষক বিক্ষোভের লক্ষ হয়ে উঠেছে মোগল রাষ্ট্রের আমলারা।

আওরঙ্গজেবের শাসনকালে সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহগুলিকে দীর্ঘদিন তাঁর অনুসৃত ধর্মান্ধ নীতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখানো হয়েছে। ইরফান হাবিব প্রমুখ আধুনিক ইতিহাসবিদগণ বিদ্রোহগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এগুলির পেছনে গভীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ ছিল এবং মোগল সাম্রাজ্যের স্থাপনের গোড়া থেকেই এই ধরনের বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চায় বিদ্রোহগুলিতে ধর্ম ও বর্ণের ভূমিকার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ ভারতের মধ্যযুগের বাতাবরণে এগুলিই ছিল প্রতিবাদের ভাষা। বলা হয়েছে কৃষক বিদ্রোহগুলি প্রচলিত আর্থসামাজিক বৈষম্য ও শোষণের ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা দিলেও ধর্ম ও বর্ণ বিদ্রোহীদের সংহতি-বিধানে সাহায্য করেছে ও তাদের জুগিয়েছে একটি প্রতিবাদী মতাদর্শ। কবীর, নানক প্রমুখ ভক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ সন্তগণ জাতিধর্মের বৈষম্যহীন যে সমাজের বাণী সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেন তা তাদের যে-কোনো শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে অনুপ্রাণিত করে। সেইজন্য ধর্ম ও বর্ণগত চেতনা কখনো জাতে ওঠার আন্দোলনে, কখনো প্রতিবাদী আন্দোলনে, কখনো শ্রেণি সংগ্রামে ঐক্য ও সংহতির সূত্র হিসাবে কাজ করেছে।